Vol. 40 | No. 3 | 1997

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

আর্টের অত্যাচার ও জীবনানন্দ দাশের ছোটগল্প

Volume	40
Issue	3
Year	1997
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Seraj Salekeen
Published online	February 1, 1997
DOI	10.62328/sp.v40i3.8
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v40i3.8
Pages	163-182
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

আর্টের অত্যাচার ও জীবনানন্দ দাশের ছোটগল্প

সিরাজুল ইসলাম

জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪) জীবিতকালে কবিতা প্রকাশে অনলস ও প্রবন্ধ প্রকাশে দ্বিধাহীন হলেও গল্প-উপন্যাস থেকে যায় পাণ্ডুলিপি-বন্দি। কোন্ শৈল্পিক প্রেরণা তাঁকে গল্প-উপন্যাস লিখতে বাধ্য এবং কোন্ দ্বিধাসংশয় প্রকাশে করে অনিচ্ছুক তা আজও অনুদ্‌ঘাটিত। সাধারণভাবে মনে হয়, যে আবেগ-অনুভব ও তত্ত্ব তিনি কবিতায় আবদ্ধ করতে সক্ষম হননি, কিংবা শৈল্পিক মান সম্পর্কে ছিলেন সংশয়ী, তা আবদ্ধ হয় গল্পের রূপাঙ্গিকে। কেননা প্রকাশের রহস্যময় তাড়না থেকে শিল্পীর নিস্তার নেই, এবং শিল্পীর অনন্য স্বাতন্ত্র্য ও অহঙ্কার সূত্রে 'জীবনানন্দ আসলে ভেবেছিলেন— রবীন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত ... প্রত্যয় উজ্জ্বল জগৎ-বিশ্বাসের বিপরীত অনুভবকে ঠিকমতো প্রকাশ করা যাবে? ভেবেছিলেন, কবিতায় না পারলে চেষ্টা করবেন গদ্যে— কারণ বলার কথাটা বলে যেতেই হবে— এই রহস্যময় আত্মতাড়না থেকে প্রতিভার পরিত্রাণ নেই।'[১] তবে কবিতায় শিল্পসৃষ্টির যে-আনন্দ জীবনানন্দ অনুভব করেছেন, গল্পে সে-আনন্দ একাত্ম হয় নি। এখানে তাঁর সচেতন মন, তত্ত্বপ্রবণ সক্রিয়তা ভাবপ্রতিভাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে সর্বদা। মনে হয় তিনি যেন দায়বদ্ধ কোন উদ্‌গারে ব্যস্ত প্রায়শ এবং এ-জন্যে 'তাঁর গল্প-উপন্যাস ঠিক জীবনরসে রসময় নয়। তত্ত্বভাবনায় জটিল।'[২] এর সপক্ষে শিথিল প্লটের আপাত বিশৃঙ্খলা, চরিত্রের বিস্তারহীনতা, পরিবেশ-বিচ্ছিন্নতা, কাম্য চরিত্রের বিপরীতে তত্ত্বালোচনায় দ্রুত পরিণত প্রয়াস ও উন্মোচনের নগ্নতা অস্বীকার করার উপায় নেই। তাঁর গল্পে যৌন সংকট ও অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা ব্যক্তিকে বিরক্ত, বিপর্যস্ত ও সক্রিয় রাখে এবং যৌন ও আর্থ সংকট-স্পৃষ্ট অনুভূতিশীল ব্যক্তিসত্তার রক্তাক্ত আত্ম-উন্মোচনই মুখ্য হয়ে ওঠে।

জীবনানন্দ দাশের অন্তর্জগৎ রক্তাক্ত হয়েছে বিচিত্র বিপরীতমুখী ঘটনা-স্পর্শে। একদিকে বরিশালের সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মপরিবারের মুক্তি ও প্রকৃতি ঘনিষ্ঠতা, রবীন্দ্রনাথের কল্যাণবুদ্ধি ও দার্শনিক গতি, গান্ধীবাদের পরিশুদ্ধতা, কিন্তু অন্যদিকে একান্নবর্তী পরিবারে ভাঙন, বঙ্গভঙ্গ, স্বদেশি বন্দেমাতরম রক্তপাত, মহাসমরবাহিত ফাঁপা মানুষের নির্জীবতা। ১৯২৯-৩০ সালের অর্থনৈতিক মহাসংকট রূপ নিলো 'অভাবনীয় মূল্য-বিপর্যয় এবং ব্যাপক বেকার সমস্যায়।' 'বোঝা গেল একই ধনতন্ত্রের নাগপাশে সমস্ত পৃথিবী বাঁধা পড়েছে এবং তার এক প্রান্তের সামান্য

অনিশ্চয়তা বা সংশয় অন্য প্রান্তের লক্ষ লক্ষ মানবের জীবনে দুর্ভিক্ষ ও মৃত্যু ডেকে আনতে পারে।'[৩] ইঙ্গ-মার্কিন অর্থ-বিপর্যয় কলকাতা বরিশালের সমাজ-পরিবার-ব্যক্তিজীবনে আঘাত হানে এবং সংশয় নৈরাশ্য-শূন্যতা-বিচ্ছিন্নতায় করে তোলে বিপর্যস্ত। এ-পটভূমিকায় লিখিত হয় জীবনানন্দ দাশের ছোটগল্প। অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা জীবনানন্দকেও তাড়া করেছে আমৃত্যু এবং ব্যবসায়িক চেষ্টা ও অর্থ-সফলতায় তিনি ব্যর্থ হয়েছেন স্বভাবগত কারণে। শিল্পীমন শিক্ষকতা পেশায় পেতে চেয়েছে স্থিতিশীলতা। কিন্তু তা-ও সর্বমোট সাতটি কলেজে শিক্ষকতার উদাহরণে রক্ষিত হয় নি। ১৯২২ সালে সিটি কলেজে শিক্ষকতা শুরু করলেও ১৯২৮ সালে চাকরি হারিয়ে ফিরে আসেন বরিশালে। এরপর কিছুকাল বাগেরহাট কলেজ ও দিল্লি'র রামযশ কলেজে শিক্ষকতা করলেও ব্রজমোহন কলেজে শিক্ষকতা লাভের পূর্বে ১৯৩১ থেকে ১৯৩৫ পর্যন্ত ছিলেন বেকার।[৪] এই ১৯৩১ সাল থেকেই জীবনানন্দ দাশ তাঁর গল্পগুলো লিখতে শুরু করেন এবং স্বাভাবিকভাবেই এ-গুলোর ভেতর অনুপ্রবিষ্ট হয়ে থাকে বেকার জীবনের অর্থকষ্ট ও সংবেদনশীল মানুষের রক্তাক্ত হৃদয়।

আমাদের আলোচ্য 'আর্টের অত্যাচার'[৫] গল্পে অর্থনৈতিক নিষ্পেষণে কবিসত্তার আর্তচিৎকার সমকালীন সমাজ-বাস্তবতার স্বরূপ যেমন উদ্‌ঘাটন করে, তেমন স্পষ্ট ধরা পড়ে পরবর্তীকালে কবিতা-বিষয়ক প্রবন্ধগুলোর[৬] চিন্তা-বীজ। গল্পটিকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়— ক. অবিনাশ, দেবকুমার ও নিখিলের আর্ট-বিষয়ক সামাজিক আলোচনা; খ. নিখিলের বেকার ও জটিল ব্যক্তিজীবনে আর্ট-অনুসন্ধান; এবং গ. অমিতার প্রসঙ্গে দৈনন্দিন স্মৃতিকাতর নিঃসঙ্গতায় আর্ট ও অতৃপ্তি। গল্পের প্রথম পর্যায়ে সাহিত্যিক তিন বন্ধুর আলোচনা ক্ষোভমিশ্রিত ও আক্রমণাত্মক এবং সে-সূত্রে অন্তর্গত অস্থিরতা ও বিচ্ছিন্নতা অস্পষ্ট থাকে না। শুরুতেই অবিনাশের বিতর্কিত মন্তব্য, 'যারা লেখক তারা ছাড়া আর কেউ আর্টিস্ট নয়।' এমন কি যারা ছবি আঁকে তারাও আর্টিস্ট নয়, কেননা ছবি এঁকে এরা ফাঁকি দেয় মনের খটকাকে।[৭] স্মরণ করা যেতে পারে আধুনিক কবিগোষ্ঠীর ওপর আক্রমণের কথা, যেখানে তাদেরকে পলায়নবাদী ও ক্লান্তির রূপকার মনে করা হতো। কিন্তু এখানে অবিনাশ স্পষ্ট করেই বলে, লেখকের মনেই কেবল খটকা, অর্থাৎ প্রশ্ন জন্ম নেয় এবং টিকে থাকে। এই প্রশ্ন সমাজের যাবতীয় আয়োজন সম্পর্কে। একই চিন্তার যমজগল্প 'পাতা তরঙ্গের বাজনা'য় বলা হচ্ছে—

> 'হ্যাঁ, তা মানুষই হোক, বা পাখিই হোক, বা হৃদয়ের আবেগ আকাঙ্ক্ষা— যা কিছু হোক না কেন, যে জিনিস একটা খটকা নিয়ে আসে, আমাকে সচকিত করে দেয়, আমি তাকে বুঝে দেখি, ভাঙাই, আমার ভাষায় আমি ব্যক্ত করি।'[৮]

কিংবা, 'তবুও যেখানেই মন খটকা খায় সেখানেই ভাঙিয়ে সহজ করে নিজে বুঝে নেয়, সকলকে বুঝিয়ে দেখাতে চায়।'[৯]

স্পষ্ট বোঝা যায় আয়োজনের ইশারায় খটকা-সন্ধান এবং তার ব্যাখ্যা-ভাষ্য তৈরি করে অন্যকে বুঝিয়ে দেওয়াই আর্টিস্টের কাজ। তাহলে এ-ক্ষেত্রে আর্টিস্টের সমাজ-সংলগ্ন সচেতনতাকে অস্বীকার করা হয়নি এবং সম্ভবত তা পলায়নবাদী হিসেবে আক্রমণের উত্তর। অন্যদিকে লেখকের উপাদান বাছাইয়ের অধিকার যেমন স্বীকার করা হয়েছে, তেমনি চিহ্নিত হয়েছে উপস্থাপনের পদ্ধতি। বস্তুকে বাছাই করে ভেঙে প্রকাশের অবাধ অধিকার কেবল রোম্যান্টিকেরাই লাভ করে থাকে।[১০] কেননা সাহিত্যে ব্যক্ত বা প্রকাশের অধিকার সাহিত্যিকের আত্মনিষ্ঠাকে প্রাধান্য দেয়।

দেবকুমার মনে করে, বিখ্যাত গায়কেরাও অনেকে ইডিয়ট কিন্তু বিখ্যাত লেখক কখনো ইডিয়ট হতে পারে না অতীত কী বর্তমানে। এর ভেতর দিয়ে তারুণ্যের ঐতিহ্য স্বীকারের প্রবণতা স্বীকৃত হলেও ক্ষোভকে অস্বীকার করা যায় না এবং বোঝা যায় আপন অনন্যতা সম্পর্কে সচেতনতা। আপাত আপত্তিকর এ-মন্তব্যগুলোর ভেতর দিয়ে আধুনিক কবিগোষ্ঠীর শৈল্পিক শ্লেষের ছায়া বিস্তারও অসম্ভব নয়। সমাজ-অসম্পৃক্ত ও প্রশ্নহীন আর্টকেই ইডিয়টিক আখ্যা দেওয়া হলো, কিন্তু অবিনাশ, দেবকুমার ও নিখিল বিচ্যুত আবেগময় মানবীয় সম্পর্ক থেকে।

> 'তিন বছর পরে তাদের পরস্পরের দেখা হল। কে জানে আবার ত্রিশ বছর পরে হবে হয়ত, কিংবা তিন দিন পরেও হতে পারে।
>
> এরা কেউ কারো জন্যে অপেক্ষা করে না, কেউ কারো সঙ্গ চাচ্ছে না।'[১১]

তবু কোন এক শৈল্পিক আদর্শ–সুনির্দিষ্ট সময় ও সমাজে যার উদ্ভব— তাদের কাছে টানে, এক সঙ্গে ঘটে সমআত্মিক উন্মোচন।[১২] এরা যতোটা লেখে, পড়েছে অনেক বেশি। অবিনাশের উপন্যাস পাঁচ বছরেও শেষ হয় না, 'তার আইডিয়া বদলাচ্ছে, স্টাইল বদলে যাচ্ছে।'

> 'যখন বের করব তখন মনে হবে তবুও যে আমি যা বিশ্বাস করি না, মানি না, সেই পচা পুরনো জিনিসগুলো, যা আমার স্টাইল নয়,— সেই পচা পুরনো জিনিস, এই সব নিয়ে এক বই বেরুল।'[১৩]

দ্রুত পরিবর্তনশীল ও বিশৃঙ্খল এক সময়ের সন্তান হিসেবে অবিনাশ অসহায়; তার বিশ্বাস, আইডিয়া, স্টাইল সবই অস্থিতিশীল; সমাজ কোথাও শিল্পীকে স্থির হতে দেয় না। প্রকাশের সময় না দিয়েই সময় ও সমাজ পরিবর্তিত হয়ে যায়, কোথাও যেন আদর্শ দানা বাঁধে না। এ-জীবন তাই একদিকে স্থিতিশীল আদর্শহীনতার, এবং বিশ্রামহীন গতি জন্ম দেয় নৈরাজ্যের। অবিনাশ তাই মুহূর্তের আর্টে বিশ্বাসী,

চিরন্তনতায় নয়। এক ধরনের শৈল্পিক অস্থিরতা লালন করে অবিনাশ, এবং তার ভেতর অনবরত যে বোধগুলোর জন্ম হচ্ছে তা রক্ষার জন্যে লেখাকে গ্রন্থরূপ দিতে উৎসাহী।

> 'কিন্তু মুশকিল বড্ড, কেউ তা ছাপাতে চাইবে না, নিজের ছাপাবার পয়সাও নেই, এদিকে লিখে ফেলে রেখেও ছাপাবার মুরোদের অপেক্ষা করে কোনো লাভ নেই। কারণ সে সুযোগ যখন আসবে তখন এ লেখার কোনো দাম নেই— আমার কাছে নেই।'[১৪]

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতির ভেতর শিল্পীর অর্থনৈতিক অসহায়তা এবং আত্মিক অহঙ্কার ও অনন্যতা স্পষ্ট। তারা লিখতে চায়, কিন্তু জীবন তাদের লিখতে দেয় না, এবং এখানেই আর্টের অত্যাচার। যে-জীবন লিখতে দেয় না তা বিকৃত-গতি ও বিশ্রামহীনতার; অর্থের অনটনে আত্মিক অপচয় তাদের কুঁকড়ে ফেলে, বিচ্ছিন্ন করে দেয় মানবীয় সম্পর্ক থেকে। তবু অস্তিত্বের প্রশ্নে তারা শেষ পর্যন্ত আশাবাদী,— অবশ্যই তা অত্যাচার ও রক্তপাতের ব্যথা সহ্য করার পর— উত্তরণ ঘটাতে চায় জীবনে।

> 'এরা প্রত্যেকেই আজও মরতে রাজি আছে। কিংবা সত্তর বছর বাঁচতেও আপত্তি নেই। অবশ্যি এরা কুকুর-বিড়ালের মত বাঁচবে না শেষ পর্যন্ত গিয়ে, এরা তা জানে।'[১৫]

গল্পটির দ্বিতীয় পর্যায়ে বর্ণিত হয়েছে কেন্দ্রীয় চরিত্র নিখিলের অর্থনৈতিক টানাপোড়েন, আত্মিক উন্মোচন ও শিল্পতাত্ত্বিক ধারণা। অবিনাশ ও দেবকুমার পরিপ্রেক্ষিতে হারিয়ে যায়। তত্ত্বের ভূমিকা প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত তাদের সক্রিয়তা। শুরু হয় বোর্ডিঙবাসী বেকার কবি নিখিলের রক্তাক্ত অন্তর্জগতের কথা। বোর্ডিঙ-এর বিচিত্র আমোদে নিখিল বিপর্যস্ত হয়, 'কেননা 'সারাদিন একটা ভাব নিয়ে তার মন আচ্ছন্ন হয়ে ছিল, সন্ধ্যার সময় লিখবার আবেগ' এলেও পার্শ্ববর্তী কক্ষে নির্বিবাদি দুই টেনিস খেলোয়ারের সচিৎকার হাসি-তোলপাড়ে কবিতা নক্ষেত্রে হারিয়ে যায়। নিখিলের 'ভাবে আচ্ছন্ন হওয়া প্লেটো নির্দেশিত দিব্যোন্মাদনা নয়[১৬] এবং জীবনানন্দ তা বিশ্বাসও করতেন না।[১৭] তবে জীবনানন্দের প্রেরণা-বিশ্বাসের সঙ্গে নিখিলের ভাব-ভারাক্রান্ত হওয়ার সম্পর্ক বিদ্যমান।

> 'কবিতা রচনার পদ্ধতি সম্পর্কে সংক্ষেপে বলতে পারা যায় এই: যখনই 'ভাবাক্রান্ত' হই, সমস্ত ভাবটা বিভিন্ন আঙ্গিকের পোষাকে ততটা ভেবে নিতে পারি না, যতটা অনুভব করি— একই এবং বিভিন্ন সময়ে। অন্তঃপ্রেরণা আমি স্বীকার করি। কবিতা লিখতে হলে ইমাজিনেশনের দরকার; এর অনুশীলনের।'[১৮]

কল্পনা-প্রতিভার অনুশীলন করতে গিয়েই সংবেদনশীল মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে সাধারণ থেকে। সাধারণের চলমান স্রোত, স্থূল আমোদ-সুখ তাদের টানে না। তবু জীবনের আনন্দ তাদের কাম্য; চকিত সংশয় ও শিথিল মুহূর্তে যেন নিখিল টেনিস খেলোয়ারদের জীবনের মুখরতাই কামনা করে। কেননা সেখানে চিন্তা নেই, এবং চিন্তার ব্যথাও নেই। কিন্তু কবির মনে পরিপার্শ্ব সম্পর্কে প্রশ্ন জাগে এবং চিন্তিত করে। 'চিন্তার সারবত্তা'[১৯] কবিকে অর্জন করতে হয় এবং তা কষ্টসাধ্য। কেবল ভাব নয়, ভাব রূপ পেতে চায় শব্দে এবং শব্দ এসে আঘাত করে কবিকে। শব্দের আঘাত অনির্বচনীয় ব্যথা দেয়, কেননা শব্দ অর্থমাত্রার গণ্ডি ভেঙে বেরিয়ে পড়তে চায়, এবং গণ্ডি ভাঙতে পারে কেবল কবি।

> 'আমাদের সাজাও, আমাদের সাজাও, আমরা নগ্ন কুৎসিত হয়ে পড়ে আছি, তুমি সাজাতে জান, তোমাকে আমরা চিনি। তুমি শৃঙ্খলার ওস্তাদ, তুমি আমাদের তুলে ধর— তোমার হাতে আমরা সুন্দর হব।'[২০]

সাধারণ আমোদ, দুঃখ-কষ্ট, জন্ম-মৃত্যুর জীবন কবির জীবন নয়। অসাধারণ হওয়া ও এই অনন্যতাই নিখিলকে কষ্ট দেয়, কেননা সে প্রাত্যহিক নষ্ট স্রোতে ভেসে যেতে পারে না। চিন্তা ও শব্দের আঘাতে তার চেতনালোক জাগ্রত হয়; শব্দ, প্রাত্যহিক শব্দ সেখানে অনন্য হয়ে ওঠে, এবং সাধারণের অনন্য হয়ে ওঠার রসায়ন প্রক্রিয়াই কবিতা। ভাব নিরূপিত হয় শব্দে, বোধের সৌন্দর্য ধরা পড়ে শব্দে এবং কবি তাই শব্দ-সুন্দরের কারিগর। তবু এই শব্দ, উপাদান কিংবা বিষয় নির্বিচার গ্রহণ নয়, চেতনালোকে বাছাই করা বিশেষ। এই বিশেষের অত্যাচার আর্ট—

> 'নিখিলকে লক্ষ লক্ষ লোকের থেকে বেছে নিয়ে এই যে চিন্তার পর চিন্তা অজস্র উৎশৃঙ্খল শব্দের পর শব্দ সঙ্গে করে নিয়ে এসে দিনের পর দিন তার বুকে এই যে আঘাত করতে থাকে, নিজেরা এই যে রূপ হতে চায়,— কি গভীর অত্যাচার এই।'[২১]

লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্য থেকে বাছাই করা একজন নিখিলের বিপরীতে টেনিস খেলোয়ার দু'জন সাধারণ— হ্যাট, স্যুট, র‍্যাকেট, চুরুট ইত্যাদিতে অতি সাধারণ। তারা জানে না শব্দ ও চিন্তার অত্যাচার। এই অত্যাচারের ভেতরই আর্টিস্টের আনন্দ ও সক্রিয়তা, যদিও অতৃপ্তি তাকে অনবরত গতিশীল রাখে। আর্ট মানুষকে সাধারণ হতে দেয় না চিন্তা-সূত্রে। যখন কোন সমস্যায় আর্টিস্ট খটকা বা প্রশ্নবিদ্ধ হয় তখন জন্ম হয় চিন্তার। এই চিন্তাই প্রশ্নসূত্রে বিষয়ের গভীরতায় পৌঁছে, যা শেষ পর্যন্ত বোধে পরিণত হয়। তা-হলে নিখিল-নির্দেশিত বাক্য 'চিন্তা, শব্দ, কবিতা, আর্ট' নতুন করে সাজালে দাঁড়ায়, বোধ $\frac{\text{শব্দ}}{}$ কবিতা, আর্ট। অর্থাৎ

বোধ যথার্থ শব্দ সহযোগে কবিতায় পরিণত হয়। বাকী থাকে আর্ট; এবং কবিতা-ই আর্ট এ-ছিলো পূর্ব সিদ্ধান্ত।

'নিখিল কবি, তাই মারাত্মক'; কেননা কবিরাই পারে সাধারণের গভীর বিশ্বাসকে তুচ্ছ জ্ঞান করতে এবং তুচ্ছের ভেতর মহত্ত্বকে আবিষ্কার করতে। তবু নিখিল পুনরায় তার কবিসত্তার অনন্য শ্রেষ্ঠত্বে সন্দিহান হয়ে পড়ে এবং তার পুরনো টেনিস স্যুট, পাশের কক্ষ থেকে হ্যাট-র‍্যাকেট নিয়ে বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়।

> 'যেখানে কোনো কবিতা কোনো আর্ট কোনো শব্দ তার নাগাল পাবে না আর। আহা, সেই জীবন, যেখানে কোন সন্দেহ নেই খটকা নেই— না চিন্তা না শব্দের।'[২২]

কিন্তু যার হৃদয় একবার আর্টের সন্ধান পেয়েছে, এতো সস্তা ফুর্তিতে সে মেতে ওঠতে পারে না। এ-জন্যে নিখিল ব্যর্থ হয়; স্যুটের পুরনো স্টাইল, ছেঁড়া চোরাই র‍্যাকেটসহ সে অন্য খেলোয়ারের নিকট হাস্যাস্পদ হয়ে ওঠে। নিখিল বুঝতে পারে তার জীবনের পথ এতো অগভীর নয়, চটুল চঞ্চলতা নয়— এ-পথ আর্টের। যদিও এ-আর্ট জীবনকে পুরস্কার সামান্যই দেয়—

> 'না, না, তুমি কাউকে কোনো পুরস্কার দাও না। তোমার পথে কোটি কোটি লোককে তুমি চলতে দাও না, তারপর একজনকে চলতে দাও, এই অত্যাচার ছাড়া তুমি আর কিছু জানো না।'[২৩]

উদ্ধৃতিটিতে আর্টিস্টের ক্ষোভ এবং অনন্যতা সমভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ 'কবিতার কথা'[২৪] এবং অন্যত্র গল্পেও[২৫] শিল্পীর অনন্যতা সম্পর্কে বলা হয়েছে।

যে হতাশা ও ক্ষোভ সমাজ-উদ্ভূত, ফলে কবি-হৃদয়ে সৃষ্টি করে অমোচনীয় ক্ষত, তার উৎস অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা ও অস্তিত্বের সংকট। নিখিলের পরিপার্শ্বে যে অর্থনৈতিক উজ্জ্বলতা ও সহজ-সুখ তা থেকে সে বঞ্চিত, কিন্তু সেই সুখ উপভোগে সে উৎসাহী। কিন্তু হৃদয়ের স্বাতন্ত্র্যে সে বারবার আর্টের মানসিক অত্যাচার অর্থাৎ কল্পনা ও বাস্তবের বৈপরীত্যে ফিরে আসে। নিখিল তাই টেনিস গ্রাউন্ডে যেতে পারে না, চলে যায় বায়স্কোপে এবং রাতে ইম্পিরিয়ালে খাসা খাবার খেয়ে ফিরে আসে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত পুরনো ঘরে। স্বপ্নে ধরা পড়ে যন্ত্রণাদায়ক অস্তিত্বের স্বরূপ, যে অস্তিত্ব অনাকাঙ্ক্ষিত—

> 'রাতের বেলা নিখিল স্বপ্ন দেখল কারা যেন শিকারে বেরিয়েছে। না জানি কি করে শিকারীর দলে পড়ে গেছে সে। তার পর শিকারীরা আর কোথাও নেই, ঝোপের ভেতর একটা পাখিকে ছটফট করতে দেখছে

> শুধু নিখিল, পাখিটা— লাল শিরা। একটা কুকুর এসে পাখির রক্তাক্ত ডানার ব্যথা চেটে নরম করে দিচ্ছে। ওরা দু'জনেই মানুষের মত কথা বলছে। কিন্তু পাখিটা ক্রমে বড়, আরো বড় হয়ে উঠছে, তার ডানা পালক টকটকে লাল, যেন আগুন জ্বলছে, তার যন্ত্রণা দারুণ।'[২৬]

সামাজিক বোধের বিপরীতে অবস্থানের যন্ত্রণা পাখিটির রূপকে নিখিল অনুভব করে। সামাজিক সংকীর্ণতার স্বস্তি নিখিলের জীবনে নেই, তার মহত্ত্ব ও গভীরতা আগুনে জ্বলে যায়, গোপন অন্তর্দাহ বহন করতে হয় অহরহ। সংবেদনশীল মানুষের মানবীয় মুক্তি এ-সমাজ দিতে পারে না, যদিও নিখিল আর্টের ভেতর দিয়ে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনাচরণ ও বোধের সন্ধানে ব্যাপৃত। বোর্ডিঙ-জীবনের নোংরামি, জীবনের অপচয় থেকে সে তিন মাসের ভাড়া অনাদায়ী রেখেই বেরিয়ে পড়ে এবং জমকালো এক হোটেলের কক্ষ একশ' টাকায় ভাড়া নেয়। সে মুক্তি চায় সংকীর্ণ জীবনের অশ্লীলতা ও আর্টহীনতা থেকে এবং অর্থকষ্টের ক্ষোভ তকে নিয়ে যায় অতি-পর্যায়ে। তার মনে হয়—

> 'কবিতা এখানে পরিশ্রম নয়, টেনিসের চিৎকারকে জয় করবার মত লড়াইয়ের ষাঁড় নয় কবি এখানে আর, আর্ট এখানে প্রবৃত্তি শুধু, পরিশ্রম নয় পরিশ্রম নয়, একদিনেই সে হয়ত অনেক লিখে ফেলতে পারবে, অনেক লিখেও আরো অনেক লিখতে পারবে। লেখা এমনই সহজ হয়ে উঠবে এখানে।'[২৭]

মূলত নিখিল তার অন্তর্জগতের ব্যথা অবসাদ ও শূন্যতা বহির্জগতের আরাম আয়েস দিয়ে ঢেকে দিতে চায়। কিন্তু জানালা দিয়ে নিচে তাকালেই চোখে পড়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনের অপচয়—

> 'রাস্তার দিকে তাকাল, কি দারুণ উৎপাত সেখানে, কি অনিষ্ট অপচয়, নোংরামি, ঘৃণা, কি দারুণ উৎপাত। বিশীর্ণ শুঁয়াপোকার মত এরা কুঁকড়ে কুঁকড়ে গুটি গুটি চলেছে, এরা। ছি, কে এদের এমন চলতে বলেছে।'[২৮]

নিখিলের আত্মিক সংকটের একপ্রান্তে কুষ্ঠরোগীর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংগ্রাম এবং অন্যপ্রান্তে হোটেলবাসী রাজা-উকিল-ব্যবসায়ীর অর্থ অপচয়ে ভোগের উল্লাস। এই দুই প্রান্তের মধ্যবর্তী নিখিলকে নিরবলম্ব মনে হলেও, এ-গুলোই তার অভিজ্ঞতার উৎস। জীবনে সে আর্টকে ত্যাগ ক'রে হতে পারে না বোধহীন চলমান সাধারণ, কিংবা হতে পারে না অর্থ আয়ত্তকারী ঘৃণ্য। তবু জীবন চলে, কুষ্ঠরোগীও খুঁজে পায় জীবনের সফলতা এবং নিখিলের মনে হয় 'কোথাও জীবন যেন তার সমস্ত প্রশ্ন ও প্রতিবাদের চেয়ে প্রবলতর হয়ে বেঁচে রয়েছে।' তাই সে স্বস্তিকর মনে

লিখে ফেলে একটি গল্প এবং তা বিকোতে চায় মাত্র ত্রিশ টাকায়।[২৯] কারণ কক্ষভাড়ার বিরাশি টাকা ঘড়ি বিক্রয় করে যোগাড় হলেও অবশিষ্ট টাকা তার নেই, কিন্তু অর্থের বিনিময়ে গল্প প্রকাশ করতে পত্রিকাগুলো রাজি হয় না। এ-ব্যর্থতা পুনরায় সংশয় ও নৈরাশ্য বয়ে আনে, এবং অনেকটা ক্রোধের সঙ্গে আত্ম-প্রত্যয় ঘোষণা করে, বিরোধিতা করে উকিল-ডাক্তার-ব্যবসায়ীর জীবন-বোধের—

> 'এরা ভাতের ওপরে উঠতে পারল কি কেউ? ভাতের ক্লেদের ওপরে?'[৩০]

নিখিল বুঝতে পারে সেই জীবনই সহজ, যারা তার মত নয়। সে-জীবন জন্ম-মৃত্যু, পাপ-পুণ্য ও স্বর্গ-নরকের সঙ্গে নিবিড়তায় প্রাত্যহিক।[৩১] কিন্তু নিখিল জীবনের সেই প্রশ্নহীন শান্ত সরলতা থেকে অনেক দূরে,[৩২] এবং এখন সে নিঃসঙ্গ।

> 'ক্রমে ক্রমে সে বুঝতে পারল সে কত একা, যে জীবন মনে মনে সে সত্য বলে ধরে রেখেছে পৃথিবীর কাছে তা কত হেয়। সে জীবনের গুরুতর দরকারের সময় তাকে সাহায্য করার জন্য একজনও কোথাও নেই।'[৩৩]

এই নিঃসঙ্গতার উৎস ও অনন্যতার রূপ সমাজকেন্দ্রিক হলেও, ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য স্পৃহাও গুরুত্বপূর্ণ। নিখিল জানে, 'আর্ট মানুষকে না দেয় সুখ, না দেয় সোনা।' তবু মহারাজার সেক্রেটারির আহ্বানে অর্থ প্রাপ্তির আশ্বাস সত্ত্বেও টেনিস খেলোয়ারী জীবনে ফিরে যায় না। একদিকে বিত্তের ইশারা, অন্যদিকে সাধারণ জীবনের আকাঙ্ক্ষা— নিখিল তবু পারে না আর্টের অত্যাচার, আনন্দ ও জীবনের চিন্তালগ্ন গভীরতা থেকে মুক্তি পেতে। এ-যেন নিয়তির মতো সৃষ্টি করে অন্তঃক্ষত, চাঁদ দেখলেও ব্যথা জেগে ওঠে। কেননা—

> '... সাহিত্য মানুষকে ভিড় থেকে টেনে আনে, তারপর ছবি দেখতে বলে, তারপর ছবি আঁকতে বলে। এ-সবই কি গভীর অসহ্য।'[৩৪]

গল্পটির তৃতীয় পর্যায়ে বর্ণিত হয়েছে নিখিলের আক্ষেপ এবং অমিতার নিঃসঙ্গতা-সূত্রে মানব-মনের চিরন্তন অতৃপ্তি। জমকালো হোটেলের চারতলায় পূর্বপরিচিত অমিতার সাক্ষাৎ পায় নিখিল। অমিতার বদরাগ, কদর্যতা এবং তীক্ষ্ণতা, অন্তঃসার এখনও নিখিলের মনে পড়ে, যদিও সে ভাবে, 'অমিতা কুৎসিত বটে, কিন্তু তবুও কুৎসিত নয় যেন।' এই অমিতাকে অনেকেই প্রেম নিবেদন করে, যদিও তার জীবনে নেই স্বস্তি, শান্তি কিংবা আনন্দ। বেকার জীবনের আর্তি নিখিলের থাকলেও, অমিতা মনে করে কাজের ভেতরই আনন্দ। কিন্তু এই মিথ্যে আনন্দের প্রবোধ কিছু পরেই ভেঙে যায়; বিশ্রামের অভাব ও যান্ত্রিক গতি মানব জীবনে যে বিকার ও রক্তাক্ত অন্তর্জগত তৈরি করে তার স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে অমিতা চরিত্রে।

'অমিতা বললে মাঝে মাঝে যেন হাঁফিয়ে উঠি। কাজ, কাজ, শুধু কাজ। অমিতা বললে, 'তখন কি করি জান?'

—'কী কর?'

— অনেক রকম রঙ কিনেছি আর ছবি আঁকবার কাগজ, আস্তে আস্তে তুলি বুলিয়ে ছবি আঁকি।'[৩৫]

তবুও জীবনে শান্তি আসেনা, কেননা বস্তু ও কল্পনার দ্বন্দ্ব অনুভূতিশীল হৃদয়কে করে রক্তাক্ত।

'যা দেখি যা বুঝি এত সুন্দর যে যা আঁকি সেটাকে ঢের নোংরা মনে হয় শুধু শয়তানি যেন![৩৬]

নিখিলের বেকার জীবনের গ্লানি এবং অমিতার বিশ্রামহীনতা সমমানের মানসিক যন্ত্রণা সৃষ্টি করে। জীবনের সুস্থতার জন্য প্রয়োজন কর্ম ও কর্ম উপভোগের বিশ্রাম কিন্তু নিখিল ও অমিতা উভয়ই বিভিন্নভাবে তা থেকে বঞ্চিত। ইনসপেকটর অব স্কুলস অমিতা তার সাবোর্ডিনেটদের দ্বারা বিরক্ত পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায়, ফলে তার ভেতর নিঃসঙ্গতার বোধ থাকে সক্রিয়। বর্তমান তাই নিখিলের মতো অমিতার জীবনেও সুখ-স্বস্তি বয়ে আনে না, এবং তখন বেঁচে থাকে কেবল স্মৃতি-কাতরতা। একই চাঁদ-জ্যোৎস্না-সূত্রে দু'জনের অন্তর্জগতই সমধ্বনি করে। ঝাউগাছের পেছনে চাঁদ ওঠলে নিখিল ভেবেছে—

'এখানে সোফার ওপরে জ্যোৎস্না, চুরুটের গন্ধ, দেয়ালে ল্যান্ডস্কেপের ছবি ... অনেক পুরনো কথা মনে হয়।[৩৭]

অমিতা জানায়,

'কাল রাতে দেখলাম ঝাউগাছের পিছনে চাঁদ, জানালার কাছে অনেকক্ষণ বসে রইলাম, জ্যোৎস্নায়, বসন্তের হাওয়া দিচ্ছিল নিখিল, সেই যে আমাদের ছোটবেলার মাঠেঘাটে যে বাতাস, ঠিক তেমনই যেন, তুমি বুঝতে যদি নিখিল, ঢের পুরনো কথা মনে হল।[৩৮]

সুস্থ জীবনের সুন্দর অভিব্যক্তি আর্ট, এবং জীবনানন্দ দাশ তাঁর 'আর্টের অত্যাচার' গল্পে সুস্থ ও সুন্দর জীবনের অভিব্যক্তি সন্ধান করেছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কলকাতা ইউরোপীয় সংস্কৃতির তরঙ্গাঘাতে বিক্ষুব্ধ, বিশেষত অর্থনৈতিক সংকটের বাস্তবতা বহন করার মতো মানসিক ক্ষমতা শিক্ষিত ও নাগরিক মধ্যবিত্তের ছিল না। একদিকে হত দরিদ্র জনগোষ্ঠী এবং অন্যদিকে অর্থসঞ্চয় ও অপচয়ের অবাধ উল্লাস তাদের বিক্ষুব্ধ ও যন্ত্রণা দিয়েছে সত্য, কিন্তু

বৃত্ত ভেঙে বেরিয়ে আসার মানসিক প্রস্তুতিও দেখায় নি, কেবল কুঁকড়ে গেছে নিজের ভেতর। তবু সংবেদনশীল মানুষ প্রশ্ন-বিদ্ধ হয়, চিন্তা ও অভিজ্ঞতায় সত্য-সন্ধান করে এবং মুখোমুখি দাঁড়াতে চায় যাবতীয় বৈপরীত্যের। একজন কবি, আর্টিস্ট কিংবা জীবনানন্দের ক্ষেত্রে, —'... যখনই তিনি সমকালের মুখোমুখি দাঁড়াচ্ছেন, তখনই ছিঁড়ে যাচ্ছে সব অবলম্বনের বন্ধন। এভাবেই একটা দিন এলো যখন তিনি প্রেম-প্রকৃতি-ইতিহাসের ছাউনি ছেড়ে কলকাতা শহরের রাস্তায় দাঁড়িয়ে এই জটিল সময়ের মুখোমুখি হলেন। দাঁড়ালেন 'আধুনিক সভ্যতা' নামের এই নির্মম, ভয়াবহ ও স্ববিরোধী বস্তুটির চোখে চোখ রেখে।'[৩৯] জীবনানন্দ অনুভব করলেন সাম্রাজ্যবাদী নিষ্পেষনে কলঙ্কিত ঔপনিবেশিক শহর কলকাতার মানব-জীবনে আর্ট নেই, কেননা এখানে সাধারণের জীবনে সুস্থতা নেই। সাধারণের অসুস্থ, অগভীর ও আর্টহীন জীবনের বিপরীতে আর্টিস্টের সুস্থ ও গভীর জীবন সন্ধানের চিরন্তন অতৃপ্তি ও আর্তি প্রকাশিত হয়েছে এবং সৃষ্টিশীলতার সূত্র ধরে প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিছু শিল্প-সূত্র।

গল্পটিতে আর্টিস্টের প্রাত্যহিক জীবনের বিচিত্র সংঘাত বর্ণনার মাধ্যমে চিরন্তন অতৃপ্তির স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। অবিনাশ, নিখিল কিংবা অমিতার জীবনের মূল কথা অতৃপ্তি, কেননা তারা আর্টের সন্ধানে ব্যাপৃত। এই আর্ট অবিনাশকে দেয় নি স্থিতিশীলতা, নিখিলকে মুক্তি দেয় নি অর্থকষ্ট ও অনির্বচনীয় অন্তর্বেদনা থেকে এবং অমিতাকে দেয় নি তৃপ্তি ও সঙ্গের নিশ্চয়তা। এর জন্যে দায়ী স্ববিরোধী সমাজ-শক্তি ও ব্যক্তিগত মনীষা, তবে আর্টিস্টের অহং ব্যক্তিগত মনীষাকেই গুরুত্ব দেয়। গল্পটিতে প্রধানত দুটি দ্বন্দ্বমূলক তত্ত্ব প্রয়োগের সক্রিয়তা লক্ষণীয়। ভাসমান জীবন-স্রোতে যে সাধারণ মানুষ, তাদের জীবনের আর্টহীনতা লক্ষ করেছেন জীবনানন্দ। প্রশ্ন ও চিন্তার সারবত্তাহীন সাধারণ অগভীর মানুষ, তাদের সঙ্গে সুস্পষ্ট বৈপরীত্য বিদ্যমান সংবেদনশীল কবিসত্তার। সহজ সুখে-আমোদে 'ভিড়ের হৃদয়' মেতে ওঠতে পারে; তেমন পারে না প্রশ্ন-বিদ্ধ কবি, যে জীবনকে ব্যাখ্যা-ভাষ্যসহ তুলে ধরে। সাধারণের জীবনের ভিন্ন প্রান্তে অবস্থান করে বিত্তবান, এবং এর সঙ্গেও একাত্ম হতে পারে না কবি। অর্থলোভী জীবনের প্রশ্নহীন যান্ত্রিকতা, ভোগের কদর্যতা সংবেদনশীল মানুষকে বিপর্যস্ত না করে পারে না। সাধারণ জীবনের সংকীর্ণতা ও বিত্তবান জীবনের কুৎসিত অমানবিকতা অবলোকন করে কবিসত্তা সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন ও নিঃসঙ্গতায় আক্রান্ত হয়। অন্যদিকে জীবন উপভোগের এবং প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা কবিসত্তার দুর্নিবার কিন্তু সমাজশক্তির পাশবতা ও ব্যক্তিগত মনীষায় অতৃপ্ত অন্তর্জগত হাহাকার করে ওঠে। শেষ পর্যন্ত বস্তুঘনিষ্ঠ জীবনের ক্লান্তি-ক্লেদের আক্রমণ-নির্যাতনে কল্পনা-প্রতিভার হাহাকার ও অতৃপ্তি গল্পটিকে ট্রাজেডির মহিমা এনে দেয়।

এক অনির্বচনীয় প্রশ্ন, চিন্তা, অভিজ্ঞতা ও আনন্দ-বেদনার অন্তর্জগতে কবিসত্তা নিমগ্ন থাকে এবং তার রূপাঙ্কনেও জীবনানন্দ দাশ মনোযোগী। প্রশ্নবিদ্ধ, চিন্তাশীল, অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ জীবনের ভাষ্যকার-বিশ্লেষক ব্যক্তি কবি এবং কবির মধ্যেই ঘটে আর্টের চূড়ান্ত প্রকাশ। কবিতার চেয়েও আর্ট মহত্তর হতে পারে, কেননা সেখানে জীবনের সুস্থতা। যেহেতু জীবন গতিশীল, আর্টও গতিশীল এবং চিরন্তন আর্ট বলে কিছু নেই। জীবনে অনবরত যে বোধের জন্ম হয় তার সুস্থতা ও প্রকাশের ভেতরই আর্টিস্টের তৃপ্তি এবং তা কবিতার ভেতরই প্রকাশ করা যায়, ফলে সিদ্ধান্ত দাঁড়ায় কবিতা শুদ্ধতম আর্ট। এই আর্ট অর্জন করার জন্যে প্রয়োজন প্রচুর ব্যথা ও অগ্নিশুদ্ধ বোধের, যাকে জীবনানন্দ বলেছেন 'চিন্তার সারবত্তা'। কিন্তু বোধ কিংবা চিন্তা কবিতা নয়,[৪০] তাকে রূপ দিতে হয় শব্দে, শব্দ-শৃঙ্খলার সৌন্দর্যে[৪১] এবং এই শৃঙ্খলা-অর্জনের অত্যাচারও কবিকে সহ্য করতে হয়। চিন্তা ও শব্দের অত্যাচারের গভীরতম উৎস কল্পনা-প্রতিভার সান্ত্বনা লাভের আকাঙ্ক্ষা, কেননা সামাজিক জীবনে সুচিন্তিত আশ্রয় নেই।[৪২] 'আর্টের অত্যাচার' গল্পে নিখিলের জীবনে এই শৈল্পিক অত্যাচার সক্রিয়— যেখানে তার সামাজিক সংকট ও আত্মিক আনন্দ। নিখিল 'প্রভূত বেদনার' পরিচয় লাভ করে জীবন থেকে এবং 'বস্তু সঙ্গতির প্রসব'[৪৩]ও অনুভব করে হৃদয়ের ভেতর, কেননা, সে কবি। কিন্তু কবিকেও জাগতিক সংকীর্ণ, ক্লেদাক্ত, অর্থলোভী মানুষের সংস্পর্শে আসতে হয়, সমাজ তাকে দিয়ে করিয়ে নিতে চায় তুচ্ছ কাজ এবং তখনই শুরু হয় কবিসত্তার রক্তক্ষরণ।[৪৪] নিখিলের অর্থকষ্ট, বেকার জীবনের গ্লানির বিপরীতে জমকালো হোটেলবাসীদের অর্থ-অপচয়ের উল্লাস চেতনাকে বিপর্যস্ত করে, প্রশ্নের সম্মুখীন করে দেয় সামাজিক বিন্যাসকে যেখানে কবিজীবনের আশ্রয় নেই।[৪৫] নিখিল, অবিনাশ, অমিতার মতো সুস্থ জীবন-প্রত্যাশী আর্ট-সন্ধানী মানুষের উন্মূল, বিচ্ছিন্ন-নিঃসঙ্গ ও অতৃপ্ত মানসিকতার ভেতর আর্টিস্টের অহং-কেও সন্ধান করেছেন জীবনানন্দ দাশ। আর্টের অনন্য বেদনা তাদের অতৃপ্ত ও গতিশীল রাখে এবং জীবনের বেদনা শিল্প বা আর্টে রূপান্তরণের মাধ্যমেই তারা মহৎ।

২

কবিতার শৈলীর মতোই গল্পের ক্ষেত্রেও জীবনানন্দ দাশ অনন্য আঙ্গিক সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। জীবনানন্দ জানেন আর্ট কেবল প্রশ্ন ও চিন্তার সারবত্তা নয়, চিন্তার রূপায়ণ কৌশলের ওপরই তার সফলতা। কবিতার ক্ষেত্রে চিত্র ও চিত্ররূপময়তা পারস্পরিক বন্ধনের ভেতর দিয়ে বোধকে রূপ দিতে এগিয়ে এসেছে এবং গল্পের ক্ষেত্রেও এ-কৌশলটি ব্যবহৃত। জীবনানন্দ দাশ কবিতায়

আপাত বিচ্ছিন্ন অপূর্ব চিত্রকল্পকে গেঁথে দিয়ে পূর্ণ একটি ভাবের প্রতিমা গড়ে তুলছেন ইমপ্রেশনিস্টদের মতো, সেখানে খণ্ড চিত্রের কোন অর্থ হয় না। ফলে গল্পের ক্ষেত্রেও খণ্ড ঘটনা সম্পূর্ণ গল্পের কোন বোধকে স্পর্শ করে না এবং তা ভ্রান্তির জন্ম দিতে পারে। সুমিতা চক্রবর্তী বলেছেন, 'কোনো প্লটকে অনুসরণ করে না তাঁর [জীবনানন্দ দাশ] রচনাগুলি। আখ্যানটির শুরু-শেষ-গতি-বিবর্তন নিয়ে তিনি ভাবিত নন কখনই। কিন্তু উদ্দিষ্ট তত্ত্বটিকে ঠিকমতো বোঝা আর বোঝানোর ব্যাপারে একটি তীক্ষ্ম সচেতনা নিরন্তর সচেষ্ট থাকে তাঁর লেখন কর্মে। দেখা যায়, সুনির্দিষ্ট কিছু পদ্ধতি জীবনান্দ প্লট নির্মাণের কাজে ব্যবহার করেন।'[৪৬] সুমিতা চক্রবর্তী জীবনানন্দের গল্পের প্লট—বিবেচনায় যে বিভ্রান্ত তা স্পষ্ট। প্লট—বোধকে রূপায়ণের জন্য আখ্যান, চরিত্রসহ একটি মানসিক পরিকল্পনা। সাধারণ ভাবে আদি-মধ্য-অন্ত যুক্ত একটি ঘটনা-প্রসারণকেই আমরা প্লট ভাবতে অভ্যস্ত এবং এ-রূপটিই বাংলা ছোটগল্পে সহজলভ্য। কিন্তু কবিতার ক্ষেত্রে তা দাবী করি না, এবং জীবনানন্দের গল্পও কবিতাময়, প্লট ও ঘটনাসংস্থানে চিত্র ও চিত্রকল্পধর্মী।

'আর্টের অত্যাচার' গল্পে আপাত বিচ্ছিন্ন তিনটি পরিস্থিতি-নির্ভর ঘটনাংশের পারস্পরিক বন্ধনের ভেতর দিয়ে সম্পূর্ণ বোধটি উপস্থাপিত হয়েছে। এ-গুলো স্বতন্ত্র ঘটনা, চিত্র বা চিত্রকল্পতুল্য, কিন্তু অনৈক্যে মূল্যহীন। গল্পটিতে আর্টিস্টের ব্যক্তিগত মনীষা ও চিরন্তন অতৃপ্তি উদ্‌ঘাটনের জন্যে সচেতনভাবেই তিনটি প্রান্ত নির্দিষ্ট হয়েছে। অবিনাশের শৈল্পিক অস্থিরতা ও অতৃপ্তি, নিখিলের অনির্বচনীয় আর্টের অত্যাচার ও বেকার জীবনের গ্লানি, অমিতার নিঃসঙ্গতা ও স্মৃতিকাতর অতৃপ্তিবোধও চেতনা-স্রোতে ঐক্য-গ্রথিত এবং সম্পূর্ণ প্লটের মর্যাদায় উন্নীত। স্বতন্ত্র তিনটি ঘটনাংশের ভেতর দিয়ে নিখিলের অতৃপ্তির বোধ চলমান থেকে অবিনাশ ও অমিতাকে আলোকিত করেছে এবং শেষ পর্যন্ত ত্রিবিধ স্রোত মিলিত হয় অতৃপ্তি সূত্রেই। সাংগঠনিক দিক দিয়ে গল্পটির তিনটি ঘটনাংশ ত্রিভুজাকৃতি নিয়েছে। অবিনাশের অস্থিরতার ঘটনা-সংগঠনকে ভূমি-সংলগ্ন একটি বিন্দু ভাবলে, নিখিলের অর্থকষ্ট ও আর্টের অত্যাচার ঘনিষ্ঠ ঘটনা কৌণিক ও ঊর্ধ্বমুখী এবং তৃতীয় অংশ অমিতার অতৃপ্তি-সূত্রে পুনরায় ভূমিমুখী। আমরা বলেছি জীবনানন্দ দাশ গল্পের ক্ষেত্রে কবিতার চিত্রময়তার কৌশলটি অবলম্বন করেছেন এবং এই চিত্র ও চিত্রকল্প খণ্ডিতভাবে অসম্ভব বা অবাস্তব মনে হতে পারে। নিখিলের ছেঁড়া র‍্যাকেট নিয়ে হ্যাট-স্যুট পরে দুপুর বেলা বেড়াতে বের হওয়া কিংবা একশ' টাকার ভাড়ায় জমকালো হোটেলে ওঠা স্বতন্ত্রভাবে কোনো অর্থ করে না, কেবল সামগ্রিকভাবেই এ-সব ঘটনার যাথার্থ্য। এ-সব অসম্ভব-সম্ভব ঘটনায় যাদু বাস্তবতার আলো বিচ্ছুরণও অসম্ভব নয়।

জীবনানন্দ দাশ বোধের প্রত্যক্ষ-স্পর্শেই চরিত্র সৃষ্টি করে থাকেন। দুই বিপরীত মনোধর্মের সংঘর্ষে সাধারণত চরিত্রগুলি এগিয়ে চলে। অবিনাশের পরিপ্রেক্ষিতে অবস্থান বোধের সূত্র বুননের প্রয়োজনে, সে সমাজ-সত্যে আপন অস্থিরতার সূত্রবদ্ধ রূপ খুঁজে পায়। প্রান্তীয় অবস্থানে অমিতাও বাস্তব ও কল্পনার দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত এবং অবিনাশ ও অমিতার অতৃপ্তির মধ্যে নিখিল সেতুবন্ধনের মতো যাতায়াত করে। ফলে গল্পে নিখিল চরিত্রটি দীর্ঘস্থায়ী এবং বোধের সূত্রধর।

কবিতার মতো গল্পের ভাষা বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে জীবনানন্দ দাশ স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ। তাঁর কবিতা ও গল্পের ভাষা একই না হলেও অনেকাংশে কবিতাময় এ-কথা স্বীকার্য। কবিতা থেকে যেমন ভাষাকে আলাদা করা যায় না, জীবনানন্দের গল্প থেকেও তেমনি ভাষা-ভঙ্গিকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। তাঁর ভাষা-ভঙ্গি ঘটনা-সংগঠনের অন্তর্মূলে নিজেকে প্রবেশ ঘটায়। এ-সূত্রে তাঁর বাক্-বিপর্যয় বা শব্দ-বিপর্যাস[৪৭] লক্ষণগুলোর উল্লেখ করা যায়।

ক. 'সেই নির্বিবাদ চিৎকার জীবনের সেই অস্বাভাবিক স্বাভাবিকতার তোলপাড়ের মধ্যে তার কবিতা তাকে বলেছে আমি এই জানালার ভিতর দিয়ে কোথায় চললাম চেয়ে দেখ। যদি আজকের মত লিখতে চাও আমার পিছে পিছে এস। তারপর সে একরাশ পায়রাভরা দেয়ালের পাশ দিয়ে চাঁদের ভিতর— তারার ভিতর হারিয়ে গেল— নিখিলের কবিতা। কিন্তু নিখিল রুমেই রয়ে গেছে।'[৪৮]

খ. 'ছেলেটি একটা দোকান দেখিয়ে বললে, 'ওখান থেকে র‍্যাকেট বদলে নিন। নেমে পড়ুন, নেমে পড়ুন'। কি বিরাট আগ্রহ তার কি বিরাটতর আওয়াজ! এ না হলে জীবনের উল্লাস কোথায়?

নিখিল নামল।

ছেলেটি জানালার ভিতর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললে, 'আমি উডবর্নে পার্কে যাচ্ছি, যাবেন?'

নিখিল বায়স্কোপে গেল।'[৪৯]

প্রথম উদ্ধৃতিটিতে দৃশ্যকল্পময় একটি গতি নিখিলের অন্তর্জগতে সক্রিয় কিন্তু বাস্তবে সে স্থির পরিচিত কক্ষে। দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে বহির্বাস্তব সক্রিয় ও গতিশীল কিন্তু অন্তর্জগতে নিখিল স্থির ও সিদ্ধান্তমুখী। দুটো ঘটনার ভেতরই পাল্টা আরেকটি ঘটনা সক্রিয় থাকে এবং সংযত-সংহত বাক্যে তা আকস্মিকভাবে প্রকাশিত হয়। তাৎক্ষণিক উচ্চারণে বাক্-বিপর্যয় ঘটলেও সমস্ত ঘটনার স্রোত তা বদলে দেয়, রূপ নেয় ঘটনা বিপর্যয়ে এবং নতুনতর প্রত্যভিজ্ঞান ঘটে। বাক্যের

কাঠামো বদলের মধ্য দিয়ে কবিতার যে বাক্-বিপর্যয়, এবং শব্দ-বিপর্যয়ের সূত্রে ভাষার সহনশীলতার পরীক্ষাও জীবনানন্দ দাশ ছোটগল্পে করেছেন।

ক. 'ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে শরীরে নিবিড় মধু জমিয়ে কত সফল সে।'[৫০]

খ. 'ম্যানেজার মাথা নেড়ে নেড়ে বললে, 'আট-দশ হাজার টাকা এই সাত-আট বছরে আমাকে দিয়েছেন আপনি, ঘরে'— একটু থেকে বললে, 'ধরে, নিলাম এই তিন মাস তার কমিশনেই গেল।' ম্যানেজার বললে, 'আমি তাই ধরে নিয়েছি, কিন্তু—কমিশন আর বেশি চলে না। এই।'[৫১]

জীবনানন্দ দাশ মনে করতেন 'উপমাই কবিত্ব' এবং ছোটগল্পেও তা অক্ষুন্ন থেকেছে। নিখিল নিজেকে তুলনা করেছে ঘাসফড়িং ও পাখির সঙ্গে। তবে তুচ্ছ সাধারণ কেরানি-জীবনের সূত্রেই ঘাস-ফড়িং-এর উপমা ব্যবহৃত কিন্তু মহত্তর জীবনের আকাঙ্ক্ষায় পাখির উপমা-চিত্রকল্প[৫২] সৃষ্টি হয়েছে। নিখিলের যন্ত্রণাদায়ক অস্তিত্বের চিত্রকল্প:

> 'না জানি কি করে শিকারীর দলে পড়ে গেছে সে। তারপর শিকারীরা আব কোথাও নেই, ঝোপের ভেতর একটা পাখিকে ছটফট করতে দেখেছে শুধু নিখিল, পাখিটা— লাল শিরা।'[৫৩]

নিখিলের যন্ত্রণাকাতর অন্তর্জগতের পরিচয় অভিব্যক্তিবাদী শিল্পরীতিতেও উদ্‌ঘাটিত হয়েছে:

> 'দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বিছানাটার দিকে অনেকক্ষণ ধরে তাকাল, নোংরা লেপটা এবড়োথেবড়ো হয়ে বিবর্ণ বালিশ দুটোর ওপর শুয়ে আছে জড়িয়ে আছে। মনে হচ্ছে যেন একজন কুষ্ঠের রোগী শুয়ে আছে।'[৫৪]

অন্তর্লীন সমাজ-ইতিহাস সচেতনতা, আত্মদর্পণে কাব্য-ভাবনার প্রতিচ্ছবি 'আর্টের অত্যাচার' গল্পটির অনন্যতার উৎস। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকাঠামোর নগরজীবনে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা ও মননহীনতার যে ক্লেদ, তা একজন কবি হিসেবে রক্তাক্ত হৃদয়ে অনুভব করেছেন জীবনানন্দ দাশ, কিন্তু বিভ্রান্ত হন নি। সমাজ-বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির অন্তর্জগতের অনন্যতার সন্ধান করতে গিয়ে আর্টের সন্ধান পেয়েছেন তিনি, কেননা সুস্থ মননশীল ব্যক্তি চলমান সমাজ-সংঘে সম্পৃক্ত হতে পারে না। সমকালে তিনি ও তাঁর মতো মানস-নির্যাতিত ব্যক্তিসত্তার চিরন্তন অতৃপ্তিকে আর্ট-স্বভাবে পরিণত করতে গিয়ে মানবাত্মার আর্তি উচ্চারিত হয়েছে, উচ্চারিত হয়েছে সুস্থ জীবনের আকাঙ্ক্ষা— যা তিনি একজন কবি হিসেবে সমাজ ও ব্যক্তিজীবনে সাক্ষাৎ পেতে চান। অন্যদিকে জীবনানন্দ দাশের কবিতা-বিষয়ক চিন্তার সূত্র গল্পটিতে বীজ-আকারে সক্রিয়। আর্ট ও আর্টের উদ্দেশ্য, আর্টিস্টের

কাজ, বিষয় ও প্রকরণ চিন্তার যে বিস্তৃত আলোচনা তিনি তিনের দশকের শেষার্ধ ও চারের দশকে প্রবন্ধভুক্ত করেছেন তা এ-গল্পে উচ্চারিত ১৯৩২ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে। সময়-সংঘাতে অন্তর্মুখী কবি আত্মজগতে ডুবতে ডুবতে গল্পের সোনালী জগতকে আবিষ্কার করতে চেয়েছেন, ফলে গল্প হয়ে ওঠেছে কবিতাময়। কবিতার চিত্রকল্পময় শৈলী ব্যবহারে কথাসাহিত্যের বাস্তবতায় জীবনানন্দ পথিকৃৎ। মূলত 'আর্টের অত্যাচার' জীবনানন্দের আত্মআবিষ্কারের গল্প; শিল্পিত স্বভাবে তিনি সময়-সংঘাতে বিচ্ছিন্ন কবিসত্তার অন্তর্জগতের উন্মোচন করেছেন। কবিতায় যে জীবনানন্দ ও প্রবন্ধের জীবনানন্দ সমন্বিত হয়ে গল্পকার জীবনানন্দ বিষয় ও প্রকরণে অনন্য হয়ে ওঠেন। সময়চিহ্নহীন কবিতা ও সমাজ-সম্পৃক্ত প্রবন্ধের মধ্যে শিল্পীর ব্যক্তিগত বেদনা-ক্ষত হৃদয় অপ্রকাশিতও থেকে যেতে পারে, কিন্তু 'আর্টের অত্যাচার' কবি ও কবিতা আবিষ্কারের সূত্র হয়ে ওঠেছে।

তথ্য-নির্দেশ

১. সুমিতা চক্রবর্তী, *জীবনানন্দ: সমাজ ও সমকাল*, ১৯৮৭, কলকাতা, সাহিত্যলোক, পৃ.২১

২. পূর্বোক্ত, পৃ.২৩

৩. দীপ্তি ত্রিপাঠী, *আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়*, ১৯৯২, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পৃ.১২

৪. '... সিটি কলেজ (১৯২২-২৮); বাগেরহাট কলেজ, খুলনা (১৯২৯); রামযশ কলেজ, দিল্লি (১৯৩০-৩১) ব্রজমোহন কলেজ, বরিশাল (১৯৩৫-৪৮)...' সুমিতা চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, পৃ.১০৬

কিন্তু দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 'জীবনানন্দ, তাঁর সময় ও সমকাল' প্রবন্ধে লিখেছেন, '১৯২৮-এর মাঝখানে কলকাতায় পড়ানোর চাকরি খুইয়ে তাকে দেশে ফিরতে হয়, এক আধবার দু'এক মাসের কর্মসূত্র বাদ দিয়ে উপর্যুপরি নানা রকম ব্যর্থ কর্মপ্রচেষ্টার শেষে ১৯৩৫-এর আগস্ট মাস থেকে দেশের কলেজেই তাঁর স্থায়ী কাজ হয়। এই কাজ থেকে ছুটি নিয়ে ১৯৪৬-এর মাঝামাঝি জীবনানন্দ কলকাতায় চলে আসেন, আর ফিরে যাননি।' শঙ্খ ঘোষ (সম্পাদক), *এইসময় ও জীবনানন্দ*, ১৯৯৬, কলকাতা, সাহিত্য অকাদেমি, পৃ.১১

৫. দেবেশ রায় (সম্পাদক), *জীবনানন্দ সমগ্র* (অষ্টম খণ্ড), ১৯৯৩, কলকাতা, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস্ প্রাইভেট লিমিটেড। সম্পাদক লিখেছেন, 'আর্টের

অত্যাচার' গল্পটি '১৯৩২-এর জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে লেখা। খাতার ৪৩ পৃষ্ঠা জুড়ে লেখা। নামকরণ জীবনানন্দের।'

৬. জীবনানন্দ দাশের *কবিতার কথা* গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধগুলো।

৭. 'বিস্ময়' গল্পে সিনেমাকে আর্টপদবাচ্য ধরা হয়নি। কেননা সেখানে জীবনের অনর্থক ব্যস্ততা, সেখানে ভাব বা কল্পনার সুস্থিরতা নেই। সতী বলেছে, 'আমি জানি যারা অতিরিক্ত সিনেমা ভালবাসে তারা এই বিকৃতিকে ভালবাসে। কল্পনাহীনতা, চিন্তাহীনতার এই বিকৃতিকে। অথচ নিজেদের তারা আর্টের ভক্ত মনে করে। আর্টকে আমিও ভালবাসি।' *জীবনানন্দ সমগ্র* (অষ্টম খন্ড), পূর্বোক্ত, পৃ-৩৫

৮. *জীবনানন্দ সমগ্র* (অষ্টম খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ.১০

৯. *জীবনানন্দ সমগ্র* (অষ্টম খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ.১০

১০. 'সাহিত্যকে সাহিত্যিকের মনোভাবের (অথবা মেজাজের, বা মানসিক ও দৈহিক প্রকৃতির) প্রকাশরূপে বিবেচনা করলে এটির মধ্যে যে আত্মনিষ্ঠ উপাদান আছে তার উপর জোর দেয়া হয়, এবং এভাবে তা শেষ পর্যন্ত আমাদেরকে নিয়ে যায় রোমান্টিসিজমের দিকে, যাতে সাহিত্যিক যা অনুভব করেছেন তাই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।' আবু তাহের মজুমদার (অনুবাদক), *এবারক্রম্বির সাহিত্য সমালোচনা*, ১৯৮৭, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, পৃ. ৪৮-৪৯

১১. *জীবনানন্দ সমগ্র* (অষ্টম খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩-১৪

১২. এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয় আধুনিক কবি গোষ্ঠীর অবস্থান। বুদ্ধদেব বসু ঢাকায়; সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণুদে ও অমিয় চক্রবর্তী কলকাতায় এবং জীবনানন্দ দাশ বরিশালে বসবাস করতেন। তবে তারা (অমিয় চক্রবর্তী ব্যতিক্রম) স্থিত হয়েছিলেন কলকাতায়।

১৩. *জীবনানন্দ সমগ্র* (অষ্টম খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ.১৪

১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪

১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪

১৬. প্লেটো তাঁর *Ion, Phaedrus* এবং *Meno* গ্রন্থ তিনটিতে গুরু সক্রেটিসের মুখ দিয়ে কাব্যসৃষ্টির পিছনে কখনও 'মিউজ'-এর ভূমিকা ব্যাখ্যা করেছেন, কখনও কাব্যসৃষ্টিকে বর্ণনা করেছেন দিব্যোন্মাদনার প্রকাশ রূপে।

১৭. বলতে পারা যায় কি এই সম্যক কল্পনা-আভা কোথা থেকে আসে? কেউ কেউ বলেন, আসে পরমেশ্বরের কাছ থেকে। সে কথা যদি স্বীকার করি তাহলে একটি সুন্দর জটিল পাককে যেন হীরের ছুরি দিয়ে কেটে ফেললাম।' জীবনানন্দ দাশ, 'কবিতার কথা', *কবিতার কথা*, ১৩৯৭, কলকাতা, সিগনেট প্রেস, পৃ. ০৭

১৮. 'কবিতা প্রসঙ্গে', *কবিতার কথা*, পূর্বোক্ত, পৃ.৪২

১৯. 'কবিতার কথা', পূর্বোক্ত, পৃ. ০৭

২০. *জীবনানন্দ সমগ্র* (অষ্টম খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫

২১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫

২২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬

২৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭

২৪. 'সকলেই কবি নয়। কেউ কেউ কবি; কবি— কেননা তাদের হৃদয়ে কল্পনার এবং কল্পনার ভিতরে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্তা রয়েছে এবং তদের পশ্চাতে অনেক বিগত শতাব্দী ধরে এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জগতের নব নব কাব্য-বিকীরণ তাদের সাহায্য করছে।' 'কবিতার কথা', পূর্বোক্ত, পৃ. ০৭

২৫. 'বেশি বয়সের ভালবাসা' গল্পে সুহৃৎ বলেছে, 'লেখা মানুষকে বড্ড নাকাল করে, আমার মনে হয় দু'চারজন লোকের শুধু লিখবার শক্তি থাকে, এক-একটা যুগে, বাকিগুলো পণ্ড পরিশ্রম করছে শুধু, ওরকমভাবে জীবনকে অপচয় করে কোনো লাভ নেই, ও সবচেয়ে মারাত্মক বিনাশ ভাবতে গেলেও শিউরে উঠতে হয়।' *জীবনানন্দ সমগ্র* (অষ্টম খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪

২৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭-১৮

২৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮-১৯

২৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯

২৯. আর্টিস্টকেও অর্থ উপার্জন করতে হয়। 'বিনয়' গল্পে সুবোধ একটি উপন্যাস লিখেছিলো কিন্তু তা কোন সম্পাদকই গ্রহণ করেনি। তখন সে টুইশনি শুরু করে। 'কারণ আর্টিস্টকেও সাধারণ মানুষের মতন খানিকটা কাজ করতে হয়, যদিও এর বিরুদ্ধে ঢের প্রতিবাদ, যথেষ্ট লড়াই, কিন্তু তবুও তাকে শোনে কে?' *জীবনানন্দ সমগ্র* (অষ্টম খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯

৩০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২১

৩১. 'বিস্ময়' গল্পে সুবোধ, 'ভাবছিল, আর্টিস্টের জীবন কি নিস্ফল। অন্য মানুষেরা যেখানে কাজ করে, কথা বলে, কথা বলে আর কাজ করে সব আপসোস মিটিয়ে দেয়, তারপর নির্বিঘ্নে ঘুমায় বা ভালবাসে, আর্টিস্টটা সেখানে লিখতে চায় শুধু।' *জীবনানন্দ সমগ্র* (অষ্টম খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭

৩২. নিঃসঙ্গতার অনুষঙ্গবাহী বাক্য: ক. 'জীবনের সমস্ত আনন্দ এখানে ধূসর হয়ে যায়।' খ. 'দেখ তাদের জীবন কত সহজ, যারা নিখিলের মত নয়।'

গ. 'আর সেই ইস্কুলের দিন থেকেই এদের এই শান্ত সরল ... পৃথিবীর থেকে নিখিল সরে চলেছে। তারপর আজ সে কতদূর এসে পড়েছে।' *জীবনানন্দ সমগ্র* (অষ্টম খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ২১

অনন্য নিঃসঙ্গতার সূত্র ধরা পড়েছে 'বোধ' কবিতায়—

'সকল লোকের মাঝে বসে
আমার নিজের মুদ্রাদোষে
আমি একা হতেছি আলাদা?
আমার চোখেই শুধু ধাঁধা?
আমার পথেই শুধু বাধা?'

৩৩. 'আর্টের অত্যাচার', *জীবনানন্দ সমগ্র* (অষ্টম খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ২১

৩৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩

৩৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮

৩৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮

৩৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫

৩৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯

৩৯. সুমিতা চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, পৃ. ০১

৪০. '... চিন্তা ও সিদ্ধান্ত, প্রশ্ন ও মতবাদ প্রকৃত কবিতার ভিতর সুন্দরীর কটাক্ষের পিছনে শিরা, উপশিরা ও রক্তের কণিকার মতো লুকিয়ে থাকে যেন।' জীবনানন্দ দাশ, 'কবিতার কথা', *কবিতার কথা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ০৮

৪১. হতে পারে কবিতা নানা রকম সমস্যার উদ্‌ঘাটন, কিন্তু উদ্‌ঘাটন দার্শনিকের মতো নয়; যা উদ্‌ঘাটিত হল তা যে কোনো জঠরের থেকেই হোক আসবে

সৌন্দর্যের রূপে, আমার কল্পনাকে তৃপ্তি দেবে; 'কবিতার কথা', পূর্বোক্ত, পৃ. ১০

৪২ 'কবিতা ও জীবন একই জিনিসেরই দুই রকম উৎসারণ; জীবন বলতে আমরা সচরাচর যা বুঝি তার ভিতর বাস্তব নামে আমরা সাধারণত যা জানি তা রয়েছে, কিন্তু এই অসংলগ্ন অব্যবস্থিত জীবনের দিকে তাকিয়ে কবির কল্পনা-প্রতিভা কিংবা মানুষের ইমাজিনেশন সম্পূর্ণভাবে তৃপ্ত হয় না, কিন্তু কবিতা সৃষ্টি করে কবির বিবেক সান্ত্বনা পায়, তার কল্পনা-মনীষা শান্তি বোধ করে, পাঠকের ইমাজিনেশন তৃপ্তি পায়।' 'কবিতার কথা', পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩

৪৩. 'কবিতার কথা', পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪

৪৪. 'প্রত্যেক মনীষীরই একটি বিশেষ প্রতিভা থাকে— নিজের রাজ্যেই সে সিদ্ধ। কবির সিদ্ধিও তার নিজের জগতে; কাব্য সৃষ্টির ভিতরে।' 'কবিতার কথা', পূর্বোক্ত, পৃ. ১১

'বিস্ময়' গল্পে সাহিত্যিকের অর্থনৈতিক কর্মে বিব্রত হওয়ার দৃশ্য: 'সুবোধের চাদর প্রতিদিনই কিছু না কিছু আহরণ করছিল। অসংখ্যক মহিষ, গরু, গাড়ি ও পৃথিবীর সব রকম লোকের ভিড়ের ভিতর দিয়ে তাকে অনেকক্ষণ ধরে চলতে হয়, এক-একদিন চাদরে খানিক গোবর লেগে থাকে, এক-একদিন চাদরের এক-একটা জায়গা খানিকটা ভিজে থাকে। কেমন ক্লেদাক্ত যেন, কালির জলের মত, কাপড়ে-জামায় নানারকম চিপটে পড়ে যায়, শু লেগে থাকে।' *জীবনানন্দ সমগ্র* (অষ্টম খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯

৪৫. 'যখন দেখি শুধু তৃতীয় শ্রেণীর সঙ্গীতশিল্পী ও চিত্রশিল্পীই শুধু নয়, এদিককার উচ্চতর শিল্পীরাও দিকে দিকে স্বীকৃত হচ্ছে তখন জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয় প্রথম শ্রেণীর কবি নির্বাসিত হয়ে রয়েছে কেন?' 'কবিতার কথা', পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬

৪৬. সুমিতা চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭-৫৮

৪৭. 'প্রধানত বাক্-বিপর্যয় লক্ষণে তাঁর [জীবনানন্দ দাশ] কথা সাহিত্যের বলবার বিষয় ও রীতি একই সঙ্গে অবশ্য বাস্তবের মাত্রান্তর ঘটায়'; অলক রায় (সম্পাদক), *সাহিত্য কোষ: কথা সাহিত্য*, ২য় সংস্করণ, সাহিত্যলোক, কলকাতা, পৃ. ৫৪

৪৮. *জীবনানন্দ সমগ্র* (অষ্টম খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫

৪৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭

৫০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮

৫১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮

৫২. 'লোক সংস্কৃতির ঐতিহ্যে সাধারণত পাখি ঊর্ধ্বায়ন, আত্মা, দৈবীক্ষমতার প্রকাশ, দেবগণের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের ক্ষমতা, উচ্চতর লোকে, পৌঁছানোর ক্ষমতা, কল্পনার বিস্তার প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।' রবিন পাল, *কথাসাহিত্যে চিত্রকল্প*, ১৯৯৪, চ্যাটার্জী পাবলিশার্স, কলিকাতা, পৃ. ৩৮

৫৩. *জীবনানন্দ সমগ্র* (অষ্টম খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭

৫৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭